‘রাশিয়ার কোনদিনও কলোনী ছিল না’

দিলরুবা শাহানা

তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির উপর। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই প্রশান্তি ও স্বস্থি মিশিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আদরের পরশ বুলিয়ে দিল। ইরা আয়নার সামনে খালি একটি মাত্র চেয়ার দেখিয়ে বললো

‘বস, বসে পড় ঝট্‌পট্‌ আমি তোমার চুল ওয়াশ ও ব্লো করে দিচ্ছি’

‘তোমার কোন কাস্টমার যদি আসে?’

‘আসলে এসির ঠান্ডা হাওয়ায় আরাম করে বসে বিশ্রাম নেবে’

গরমে ক্লান্ত ও ত্যক্তবিরক্ত আমি ইরা বা ইরিনার এমন সুন্দর প্রস্তাব ফেলতে পারলাম না। ইরিনা সোভিয়েট উক্রাইনের(যদিও ইংরেজীতে লেখা হয় ইউক্রেইন মূল ভাষায় বলা হয় উক্রাইন) খারকোভ শহর থেকে এসেছে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ইরা ওই শহরের এক ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর ছিল। এই দেশে এসে নতুন বিদ্যা কেশবিন্যাস শিখেছে। ধীরে ধীরে সে এখন ভাল একটি হেয়ারড্রেসিং দোকানের মালিক। তার কর্মি সংখ্যা হবে আট নয় জন। তার লিডারশীপ ক্ষমতা বেশ সহজাত। নিজ দেশ উক্রাইনে যেমন ছিল কারখানার পরিচালক এখানেও সে নিজ ব্যবসার মালিক-পরিচালক।

প্রায় পাঁচফুট সাতআট ইঞ্চি লম্বা স্বাস্থ্যে ও সুষমায় ভরপুর প্রাণবন্ত মাঝবয়সী রুশনারী(যদিও উক্রাইন থেকে এসেছে তবে জাতিতে সে ‘রুস্কাইয়া, নি উক্রাইনকা’) ইরা। খুব যত্নে মাথা ধোয়ানো শেষে ভিজা চুলে যখন তোয়ালে জড়াচ্ছিল আমি ওকে আচমকা এক প্রশ্ন করে বসলাম

‘তোমার কি বিরক্তি লাগছে?’

‘নাহ্‌ কেন?’

দ্বিধা নিয়ে বোললাম

‘মানে বলছিলাম কি এই যে তুমি এতো আন্তরিকভাবে আমার চুল ধুয়ে দিয়েছ, বাদামী চামড়ার এশিয়ান, কালো চামড়ার আফ্রিকান মানুষও তোমার কাস্টমার তাই ইচ্ছে হল জানতে নানা জাতের নানা বর্ণের মানুষের চুলের যত্ন করতে তোমার খারাপ লাগে কিনা;

‘খারাপ লাগার কি আছে? সাদা কালো তাতে কি মানুষতো সবাই; তাই না?’

‘শোন আমি দেখেছি বিলাত আমেরিকায় কখনোও কখনো অনেক সাদা মানুষই কালো ও বাদামীচামড়ার মানুষের দিকে কেমন বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকায়, তাদের আচরণে অবজ্ঞা মেশানো থাকে তাই কথাটা বলা।’

‘শোন রাশিয়ার কখনো কলোনী ছিল না’

‘তো?’

‘তাই তারা কোনদিন কলোনীর প্রভুর চোখে বাকী সব মানুষদের দেখতে শিখেনি; যার ফলে একদল আরেক দলকে ঘেন্না করার অভ্যাসটাই গড়ে উঠেনি। আরেকটা বিষয়ও সত্য কলোনীর বাসিন্দারাও সাদাদের ভাল চোখে দেখে না, অবশ্য এই না দেখার পেছনে কারন হল কলোনীর বাসিন্দাদের প্রতি কলোনীর মালিকদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও অপমান করার জঘন্য ইতিহাস।’

ওর কথাটা আমাকে ভাবতে বাধ্য করলো। আমি রাশিয়াতে(সঠিক হবে বলা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে) পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন তেমন কোন বর্ণবিদ্ধেষ চোখে পড়েনি ওখানে। বাকী দুইদেশে কালো ও বাদামী চামড়ার মানুষের প্রতি কোন কোন সাদা মানুষের(সব সাদা মানুষের নয়) বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা লক্ষ্য করেছি।

একবার আমেরিকান এয়ার লাইন্সের নিউইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে লন্ডনের হিথরোগামী প্লেনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা মনে পড়লো। প্রথমতঃ আমি চেয়েছিলাম ননস্মোকিং জোনে সিট, তখন প্লেনে সিগারেট খাওয়া যেতো। প্লেনে ঢুকে বসতে গিয়ে দেখি আমার সিট আটাশ নম্বর সারিতে। পরের সারি উনত্রিশ নম্বর থেকেই শুরু হয়েছে স্মোকিং জোন। বিশাল প্লেনের আগের সারিগুলোতে অনেক সিটই খালি রয়েছে দেখলাম। আমি বিরক্তি নিয়ে আমার নিজের সিটে গ্যাট হয়ে বসে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন নন-স্টপ উড়াল যাত্রায় আরও কিছু বিষয় খেয়াল করলাম। সাদা মানুষ বোতাম টিপে হোষ্টেসকে ডেকে কিছু চাইলে চট্‌ করে এনে দিচ্ছে, একজন সাদামাটা নীরিহ এশিয়ান(উপমহাদেশীয় অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এর কোন একটির হবে) মহিলা পানি চেয়ে তিন তিনবার বোতাম টিপলেন, হোষ্টেসও আসলো, শুনলোও। তারপর উধাও হয়ে যায়। পানি নিয়ে আর ফেরত আসে না। প্লেনে মানুষ ডিহাইড্রেটেড হয় খুব, তাই পানি পিপাসা পাওয়া খুব

স্বাভাবিক। চতুর্থবার আমি বোতাম টিপলাম। হোষ্টেস এলো। সিট নিয়ে বিরক্তিতো ছিলই আমার সে কারনে বোধহয় গলা চড়িয়ে কেটে কেটে জানতে চাইলাম

'হোয়াটস্ রং উইথ ইয়োর আমেরিকান এয়ারলাইন্স?' বলেই আমি থামলাম

তটস্থ বিব্রত গলায় সে বললো 'সরি'

'লুক, দ্যাট লেডী থ্রি টাইমস আস্কড্ ফর ওয়াটার বাট শি ওয়াজেন্ট সার্ভড?'

আমার ধীরস্বরে উচু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথায় আসপাশের সবাই সতর্ক চোখে তাকালো। সবার দৃষ্টিবানে ম্রিয়মান হোষ্টেসটি কেমন নার্ভাস গলায় বললো

'সরি, প্রবাবলি হার ইংলিশ ওয়াজ...

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম

'লিসেন্ তুমি আমার ইংলিশ বুঝতে পারছো তো?

'তোমারটা ফাইন ম্যাম'

'সেও আমার মতোই বলেছে, আর শোন প্যাসেঞ্জারের মুখের কথা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তবে হোষ্টেস হিসাবে কাজ করা কি উচিত?'

আমার প্রশ্নের বানে বিদ্ধ হয়ে সে

'সরি, সরি এখনই পানি নিয়ে আসছি'

বলেই ছুট্লো। পানি নিয়ে যখন ফিরলো মেয়েটি পেছন পেছন ওর বসও আসলো। আমাকে বস বললো

'এই ইনসিডেন্সের জন্য আমরা রিয়েলী সরি! তুমি কি কমপ্লেন করবে?'

'নাহ্ তবে আমি ফ্রি-ল্যান্স রাইটার এটা নিয়ে হয়তো পেপারে লিখতে পারি'

ওর মুখ ভীত দেখালো। পেপারে লেখালেখি হলে ওদের পেটে লাথি পড়বে তাই ওরা ভয় পায়।

যাই হউক হিথরো এয়ারপোর্টে সেবার আট ঘণ্টা ট্রানজিট লাউঞ্জে থাকতে হয়েছিল। ভাবছিলাম আবারও হয়তো সিগারেটের ধূয়া সহ্য করতে করতে ঢাকায় ফিরবো। হঠাৎ দেখি পরিচিত চেহারা। শিরিন হক তার ছোট্টবাবুকে(যদ্দূর মনে পড়ে ওর ছেলের নাম বারিশ) বুকে ঝুলিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে, পেছনে ওর স্বামী গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ডঃ জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীও। ওদের সাথে কথাটথা হল। জানলাম ওরা দিল্লীতে নেমে যাবে। কথার মাঝে নিউইয়র্ক থেকে সিটটা স্মোকিং জোনের কাছে থাকার বিষয়টাও উঠলো। জাফরুল্লাহ্ ভাই চমৎকার বুদ্ধি দিলেন। বোর্ডিংপাস নেওয়ার সময় মেয়েটিকে জানালাম

'আমার সিটটা স্মোকিং জোন থেকে যত দূরে সম্ভব দিতে হবে কারন ধূয়াতে আমার ব্রীদিং প্রবলেম হয়'

মেয়েটি চোখ বড় করে আমাকে দেখলো। বোর্ডিংপাস লিখতে লিখতে বললো

'একবার এক যাত্রীর এ্যাজমার কারনে মাঝ পথে প্লেন নামাতে হয়েছিল'।

এ্যাজমা যে এতো বড় এক বিষয় আমার জানা ছিল না। ডাক্তার মানুষতো তাই বুদ্ধিটা রোগবিষয়ক এবং একেবারে জিনবশ করার শক্ত মন্ত্র বা দোয়ার মত কাজ করেছিল। এখন তো প্লেনে সিগারেটই নিষেধ।

এবার ইরিনার কথায় ফিরি। ওদের দেশে সেই সময়ে মার্কস লেনিনের মানবমুখী নীতি চর্চ্চার ফলে মানুষকে অবজ্ঞা-অবহেলা-অপমান করার প্রবণতাটা ছিলনা। তবে অন্য চামড়ার মানুষকে প্রথম দেখলে বিস্ময় আর কৌতূহল যে হতোনা তা নয়। স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা ঘৃনা নয় অবশ্যই। তেমনি এক কৌতূহলী বাচ্চা মেয়ের কান্ড শুনে আমরা খুব হেসেছিলাম। এক এগ্রিকালচারাল কালেক্টিভ ফার্মে নানান দেশের ছাত্ররা এক্সারসনে গিয়েছে। ঐ এলাকার মানুষ আগে কখনো কালো বা বাদামী চামড়ার মানুষই দেখেনি। ছোট্ট একটি মেয়ে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল মিটানোর জন্য চট্ করে মায়ের হাত ছেড়ে ছুটে এসে একজন ভিন্জাতি মানুষের হাতের পিঠে আঙ্গুল ঘষে আঙ্গুলটাতে গায়ের রং উঠে এসেছে কিনা দেখছিল।

তখনকার ইরার দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে জৌলুসের ছড়াছড়ি ছিল না ঠিকই তবে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব দ্রব্যাদি ও বাস-ট্রেন-প্লেনের ভাড়া ছিল খুব সস্তা। সবচেয়ে বড় কথা সবারই জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ছিল নিশ্চিত। তবে হাস্যকর হলেও দাঁতমাজার জন্য ভাল টুথপেষ্ট, গায়ে মাখার ভাল সাবান, চুল ধোয়ার ভাল শ্যাম্পু ছিল না।

রাষ্ট্রের একদিকে সাবমেরিন, কালাশনিকভ, মহাশূণ্যযান, পরমাণু বোমা বানানোর অসাধারন দক্ষতা থাকলেও ভাল টুথপেষ্ট, গায়ে মাখার ভাল সাবান ও শ্যাম্পু তৈরীর চেষ্টা ছিল না। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ উদ্যেগী হয়ে কোন কিছু উৎপাদন

করার উপায় ছিলনা। কারন সমষ্ঠির স্বার্থে ব্যক্তিমালিকানা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ বা আল্লাহ্ থেকে ইবলিশ সবার কাজ রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিয়ে করতে হতো। জনসাধারনের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা ও কর্মসংস্থান করার পর এবার রাষ্ট্র সমরাস্ত্র বানাবে নাকি জনগণের জন্য ভাল টুথপেষ্ট, ভাল সাবান, ভাল শ্যাম্পু বানাবে? কোনটা করবে? ভেবেচিন্তে অস্তিত্ত রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র শেষে সমরাস্ত্র বানানোই বেছে নিয়েছিল ।

সীমিত আকারে ও রাষ্ট্রের গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে রেখে ব্যক্তিউদ্যোমকে অনুমোদন ও উৎসাহ দিলে হয়তোবা উদ্যোমী মানুষেরাই সাবান-শ্যাম্পু- টুথপেষ্ট বানাতে পারতো, মানুষের প্রয়োজনও মিটতো সবচেয়ে বড়কথা রাষ্ট্রকে তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামাতে হতোনা।।

ইরার সঙ্গে এসব নিয়ে কোন কথা বলিনি, বন্ধুমানুষ পাছে কষ্ট পায়। মানুষ কথা বলতে পারতোনা, কথা বলার স্বাধীনতা একেবারেই ছিলননা বিষয়টা একশতভাগ সত্যি নয়। সেই সময়েই পড়েছি ও দেখেছি ওদের কমসোমলস্কায়া প্রাভদা পত্রিকাতে (তরুণদের পত্রিকা)তরুণরা প্রশ্ন তুলেছে, তর্কবিতর্ক করেছে যে তাদের দেশে যখন চুইংগাম, জিন্সের(র‍্যাংলার, লিভাইস আর টেক্সাস জিন্স এর জন্য পাগল ছিল তখন ওরা) মত সাধারন জিনিস পাওয়া যায়না তখন তারা কেন মহাশূণ্য অভিযানে এতো এতো অর্থ খরচ করছে।

ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ হলেই মানুষের সার্বিক মঙ্গলসাধন সম্ভব এই চিন্তা থেকেই শ্রেনীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখা। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তি নয় সমষ্ঠির মঙ্গলে ব্রত এক সমাজব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা ১৯৯২নাগাদ ভেঙ্গে পড়লো । সেই সময় ১৯৯৩এ এপ্রিল মাসের কোন এক সংখ্যায় 'সানন্দা' পত্রিকার সম্পাদিকা চিত্রশিল্পী ও চিত্রনির্মাতা অপর্ণা সেন তার সম্পাদকীয় কলামে লিখেছিলেন "সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে গেল মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল"। বাক্যটি অসম্ভব সুন্দর অস্বীকার করা যাবে না।

তবে প্রতিটি মানুষ এক নয় এবং সবাই স্বার্থত্যাগেও প্রস্তুত নয়। আসলে মানুষই প্রথম যখন পাথর ঘসে হাতিয়ার বানালো সেটিই হল তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। তা দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে, আস্তানা রক্ষা করে, পশুপাখি বধ করে নিজের খাদ্য জোগায়। যে কোন অবস্থাতে সে তার হাতিয়ারটি হারাতে রাজী নয়। এই হাতিয়ার মানুষের অদম্য উদ্যমের ফল। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সব মানুষের প্রয়োজন মিটাতে তৎপর ছিল তবে মানুষের একান্ত নিজস্ব উদ্যমকে উৎসাহিত করার বিষয়টি নিয়ে ভাবেনি। অন্যের ক্ষতি না করে, অন্যকে শোষণ না করে নিজস্ব উদ্যম ও উদ্যোগে মানুষের নিজস্বকিছু অর্জনের সুযোগ যদি থাকতো সমাজতান্ত্রিক সমাজে তবে হয়তো এই সমাজব্যবস্থা অন্যমাত্রা পেতো।

অনেক কামান-গোলা-অস্ত্র তৈরী হয়েছিল সাম্যের দেশ ও সাম্যের সমাজ রক্ষার তাগিদে। সে সমাজব্যবস্থা ভেস্তে গেল। যে রাষ্ট্র, যে সমাজ একদিন ছিল মানুষের কান্ডারী আজ সে রাষ্ট্র অস্ত্রের কারবারী । শোনা যায় সিরিয়ার অগণতান্ত্রিক শাসক আসাদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র ফেরী করে বেড়ায় এককালের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া!

ইরিনাকে এর কিছুই আমি বলিনি পাছে ও কষ্ট পায়। ওর ভাষাটা জানি বলে প্রয়োজনে ইংরেজীতে লিখা নানান ডকুমেন্ট বুঝিয়ে দিতে বলে। একবার ইমিগ্রেশন বিভাগকে ওর পক্ষ হয়ে কড়া যুক্তি দিয়ে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম ওতে ওর খুব উপকার হয়েছিল। তাতে সে ভীষণ খুশী।

চুলচর্চ্চা শেষ হল। ওর কিছু তথ্য জানার ছিল, আমার জানা বিষয়গুলো বুঝিয়ে বোললাম, বাকীটা অন্যকোন সূত্র থেকে ওকে জানতে হবে। বিদায় মূহূর্তে ও গভীর আন্তরিকতা মিশিয়ে মজা করে বললো

'এই যে ঈসেনিনের শাগানে তোমাকে ধন্যবাদ'।

ঈসেনিনের কথা ভেবে মনটা বিষন্ন হল। রুশ কবি সের্গেই ঈসেনিন। অবাক হতাম যখন অনেক রুশ লোক আমার নাম শুনে বলতো

'আহ্ হা! এতা ঈসেনিন নাপিসাল আ তিবিয়ে "শাগানে তী মাইয়া শাগানে"(ওহ্ হো! ঈসেনিন তোমাকে নিয়েই লিখেছে শাগানে তুমি আমার শাগানে)'। ঈসেনিন ইতিকথা আরেকদিন শুনা যাবে।